ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 186-191
www.athenajournalcbm.in

সৌন্দর্যদর্শনে ঋষি অরবিন্দ

পিয়ালী ভট্টাচার্য*

প্রাপ্ত: ২৭.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ০৮.০৫.২০২৪ গৃহীত: ০৮.০৭.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *সৌন্দর্যের অনুসন্ধান মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সাধারণ মানুষ এই সৌন্দর্যকে অনুভব করতে চান জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে আর লেখক-কবি-শিল্পী ও দার্শনিক সৌন্দর্যকে খোঁজেন আপন সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম ব্যক্তিত্ব অরবিন্দ যেমন বিপ্লবী হিসেবে কীর্তিত, তেমনই যোগসাধনায় বা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে তিনি যোগী ও ঋষি অরবিন্দ রূপে অভিনন্দিত। এই দুই পরিচিত সত্তার বাইরে আরেক সত্তা তাঁর আছে তিনি কবি। The Future Poetry, Letters on Poetry, Literature and Art ইত্যাদি গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করতেন যোগীরা লেখক হন অন্তরের তাগিদেয়। সুন্দর কোনও আকস্মিক ভাবনার ফসল নয়। আনন্দ হল সৃষ্টির আত্মা এবং সৌন্দর্য হল তাঁর তীব্র ভাবচ্ছবি। তিনি মনে করেন কবি যখন ব্যবহারিক জীবন থেকে ঊর্ধ্বতন সৃজনশীল ও আত্মপ্রকাশক্ষম লীলার অংশীদার হন, তখন তিনি পান দিব্যানন্দ অরবিন্দ এবং তারপর তিনি হয়ে ওঠেন সৌন্দর্য ও আত্মার বাণীবাহক। তাঁরা আত্মার আনন্দকে অনুভব করেন ও তাঁদের মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। এক উন্নত আত্মার ও চেতনার বিকাশই তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে ধরা দেয়।*

সূচক শব্দ: *সৌন্দর্য, কবি, অন্তর, সৃজন, যোগী, ঋষি, চেতনা, আনন্দ, বাণী।*

*সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: bhattacharyapiyalicbm@gmail.com

সৌন্দর্য কি—এ বিষয়ে যুগ যুগ ধরে তাত্ত্বিকেরা নিজেদের ভাবনাকে প্রকাশ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে বিনা প্রয়োজনের আনন্দকে সৌন্দর্যের স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সৌন্দর্যের সঙ্গে আনন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এ আনন্দ সাধারণ প্রয়োজন সিদ্ধির আনন্দ নয়। এ আনন্দে চাওয়ার তৃপ্তি নেই, কেবল পাওয়ার তৃপ্তি আছে। আর যে চাওয়ায় তৃপ্তিও আছে তা বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গের বাসনাকে রূপে রঙে প্রকাশ করতে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। যখন চিত্রকর বা কবির হৃদয়ে একটি অস্ফুট মূর্তি ভেসে ওঠে কবি বা চিত্রকর তাকে রূপ দিতে গিয়ে আবেগের সঙ্গে হৃদয়ের একটি বিশেষ স্পর্শের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। এই চেষ্টা জাগ্রত মনোবৃত্তির উপর ভাসমান হলেও সুপ্তপ্রায় অন্তরের পর্দার মধ্যে যথার্থ কাজ চলতে থাকে। এই অস্ফুট মনোবৃত্তির ছায়া শব্দে-ছন্দে-সুরে-রঙে-রূপে-রসে কায়া রূপে প্রতিফলিত হয় সৃষ্টির মাধ্যমে। কিভাবে এটি সৃষ্টি তা কেবল স্রষ্টার অনুভূতিবেদ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।[১]

অর্থাৎ স্রষ্টা যেন এক বিশেষ আবেশে অন্তরের নির্দেশে তারই আজ্ঞা বহন করছেন। যেন এই সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করে, জগতের সঙ্গে কেবল প্রয়োজনের সম্বন্ধ না করে আনন্দের সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয়। ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যবোধ থাকলেওমনের বড়ো অংশ জুড়ে যে সৌন্দর্য আমাদের সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে তাকেই রবীন্দ্রনাথ চরম সৌন্দর্য বলেছেন।

ভারতবর্ষে যুগে যুগে কবি ও ঋষিদের আবির্ভাব ঘটেছে যারা মানবীয় প্রজ্ঞায় অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যে ঈশ্বরের পরম প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। বাঙালির কাছে স্বদেশী আন্দোলনের বীর নেতা শ্রীঅরবিন্দ মহাযোগী ও ঋষিরূপেই পরিচিত। তাঁর যোগ সাধনা কেবল মানব জাতির সাধনা নয়, তাঁর যোগ এক সুকুমার শিল্প সাধনা যা অদৃশ্য কতকগুলি শক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের দ্বারা মানবজীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলে। তাঁর উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে ভগবানের উপলব্ধি ও প্রকাশ, তিনি বলেন— "আমাদের যোগ আমাদের জন্য নহে, মানবজাতির জন্য", তাঁর লক্ষ্য মানবজাতির পরিপূর্ণ পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন। মানবজীবনের রূপান্তর বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন যে মানবজীবন পশুজীবন থেকে উন্নততর একটি জীবনে অনিবার্যরূপে পৌঁছেছে সেই জীবনে ভাগবত চেতনার অবতরণ ঘটে শুদ্ধির পথে নিয়ে যাবে। আসবে চৈতন্যময় করুণার ধারা যা স্থুল শরীরে প্রবেশ করে ভাগবত সত্যের পরিপূর্ণ লীলা ও ছন্দে মানবজাতিকে গড়ে তুলবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন বিপ্লবী বীর। কিন্তু রাজনৈতিক জীবন বেশিদিন তাঁকে শান্তি দিতে পারেনি। তিনি আরেক বৃহত্তর জীবনে একাগ্র মনোনিবেশ করলেন। এই একাগ্রতা তাঁকে এনে দিল আধ্যাত্মিক শক্তি ও চেতনা। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত নির্জনে মহাশক্তির সাধনা করে গেলেন। মাসের পর মাস বছরের পর বছর তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন মানুষ কেমনভাবে পৃথিবীর উপর দিব্যজীবনের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। তিনি লিখলেন—The Future Poetry. বাংলায় ভবিষ্যতের কবিতা। বিশ্বের কাব্যসমুদ্র আলোচনা করে নূতন সূর্যোদয়ের আলো দেখতে পেলেন। এই আলোতে অনুভব করলেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। যেখানে দেখেছেন নূতনের প্রথম আলো। শুনতে পেলেন যথার্থ আধুনিকতার সম্ভাব্যএক বস্তু। তিনি বলেছেন—রবীন্দ্রকাব্যের দ্রুত আকস্মিক সাফল্যের মুলে নিহিত রহস্যটি হল—তাঁর মধ্যে এই নতুনত্ব যে জিনিসটির জন্য আধুনিক মন অনুসন্ধানরত সমসাময়িক অন্য সকলের চেয়ে তাঁকে তিনিই বেশি

প্রকাশ করে প্রসার করে দিতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যে বর্তমানের এপারের সীমা অতিক্রমণের ক্লান্তিহীন অশেষ সংগীত, মন্ত্রধ্বনিমুখর দৈবলোক উদ্ভাসিত সেখানে আত্মলোকের সত্যতার সূক্ষ্মধ্বনি ও আলো নিয়ে জীবনের ক্রমসুন্দর ধারাগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঋষিকবি শিল্প ওসাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছিলেন। একাধিক পত্রে সৌন্দর্য সংক্রান্ত আলোচনায় অন্তরের গহন ও গভীর উদ্ভাসনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৩৪ এর ১০ নভেম্বর একটি চিঠিতে—(The Poet, The Yogi and The Rishi) The poet imaging mental or physical beauty is for the outer mind somethingmore spiritual than the seer or the God lover experiencing the eternal peace or the ineffable ecstasy. Yet the Rishi or Yogi can drink of a deeper draught of Beauty and delight than the imagination of the poet at its highest can conceive.[২]

তিনি মনে করতেন সাহিত্য, শিল্প, কবিতা, বিজ্ঞান সবই 'preparation of the consciousness of life' যা মানুষকে পৌঁছে দেয় Divine life-এ। পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাব্যবিচার করে তিনি পান Supreme imaginative originality, supreme poetic gift. তিনি বলেন "কাব্যবাণীর যত সোজাসুজি অন্তরাত্মার কাছে পৌঁছে তার গভীরে তলিয়ে যেতে পারে, কাব্য ততই মহৎ হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাব্য যতদিন না যন্ত্রের এই আনন্দকে বিশেষ থেকে নির্বিশেষ করে তাকে অন্তরাত্মার গভীরতর আনন্দে রূপান্তরিত করছে, ততদিন সে তার ব্রত সিদ্ধ করতে পারছেনা। অন্তত তার মহত্তম ব্রত তো নয়ই। দিব্য এক আনন্দ—যে আনন্দ একাধারে ব্যাখ্যাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ঘাটয়িতা এবং রূপনির্মাতা, সেই আনন্দকেই কবির আত্মা অনুভব করে থাকে"।[৩]

অর্থাৎ কবির মধ্যে আছে সেই শক্তি ও অনুভবের সত্য যার ফলে তিনি শোক-দুঃখ- বিষাদ-বেদনা বা কুৎসিতকে সুন্দর করে তুলতে পারেন আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে। কখন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ আনন্দে নিমগ্ন থাকা যায় তখন সমস্ত বস্তুই তার চোখে সৌন্দর্যের রূপ নেয়। কবিকে তিনি নিছক শব্দ শিল্পী বা কল্পনাবিলাসী বলতে চাননা। কবি শাশ্বত সৌন্দর্য ও আত্মার বাণীবাহক।

রীতির দিক দিয়ে ইংরেজি কাব্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং তার শক্তি ও সামর্থ্যও অনেকটাই এই রীতি থেকে পায়। কিন্তু তিনি অনুভব করেন কবির একটি অন্তরঙ্গ দৃষ্টি আছে যা আধ্যাত্মিক আবেগ ও সত্যপ্রকাশক বাণী দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মা স্পন্দিত হয়ে উঠতে পারে। এই জিনিসটা কবি আবিষ্কার করে যখন সে অন্তরস্থিত জ্যোতির্মণ্ডলে প্রবেশ করে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন— "এই জ্যোতিঃলোকে আমাদের অন্তরমানস বস্তু, ভাব ও আবেগকে শুধু স্বচ্ছভাবে, সুস্পষ্টভাবে বা সমৃদ্ধ রূপেই দেখে না, বরং তাদের দেখে একটা রূপান্তরকারি জ্যোতির চকিত চমকের মধ্যে অথবা জ্যোতির প্লাবনের মধ্যে।"[৪]

তিনি ড্রাইডেনের কবিতার মধ্যে ও শেলির কবিতায় এই ঝলক লক্ষ্য করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর Ode to beauty-র প্রসঙ্গ তুলে ধরেন—

Me this unchartered freedom tires,
She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight;
A lovely apparition, sent
To be a moment' s ornament.

এই শক্তির সীমার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময়ী বাণী খুঁজে পেয়েছেন। তিনি প্রসঙ্গ এনেছেন শেলির—

The silent moon,
In her intertunar swoon.

এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর—

The flash upon that inward eye
Which is the bliss of soliticide[৫]

আমরা যদি কবিতার বাহ্য গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে সে শব্দগুলো আমাদের মধ্যে কেবলই পার্থিব জগতের কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এই ধ্বনিগুলো বিশেষ শক্তি, ভাব ও ধারনার প্রতিনিধিরূপে এদের অবস্থান। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এদের সূত্রপাত হলেও বুদ্ধির সহায়তায় তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। কিন্তু যদি মনস্তাত্ত্বিক দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় তবে দেখা যাবে ভাষার মূল উপাদান সূক্ষ্ম চিৎশক্তি। ধ্বনির অন্তরকে যা ভরে রাখে। লেখক একেই বলেছেন ধ্বনি দেহের আত্মা। এক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকদের ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনা স্মরণযোগ্য। তারা মনে করেন বাচ্যকে ছাড়িয়ে যা বিষয়ের গভীরের ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করে তাকেই ধ্বনি বলা হয়। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বন্যালোক গ্রন্থের শ্লোক উল্লেখ করে বলেন—

যত্রার্থঃ শব্দো বা আর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ[৬]

অর্থাৎ 'যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন'। ধ্বনিবাদিরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন ধ্বনি যা কাব্যের আত্মা। কাব্যের আত্মা ধ্বনি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের কয়েকজন কয়েকজন কবি ও আলংকারিক সংস্কৃত আলংকারিকদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। সমালোচক ব্রাডলে বলেছেন— "About the best poetry, and not only the best there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lusk the secret of all" (Oxford Lectures on poetry)[৭]

রসবাদীরা আরও একধাপ এগিয়ে বললেন রসাত্মক বাক্যই কাব্য— "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। রস দেশ কালের সীমার অতিক্রমি অলৌকিক বস্তু। এই রসবাদীরা অনন্তবাদী। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন— "Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility".— এ যেন ভারতীয় আলংকারিকদের রূপান্তরবাদেরই অস্পষ্ট অনুভূতি। শ্রীঅরবিন্দের গভীর অন্বেষা সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাবনাকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি স্পষ্টই অনুভব করেন মানবমনের বিকাশমান আত্মসচেতন মানস শক্তি। বৈদিক মনীষীর মত তিনি একে বলেন বাক। বাক শক্তির প্রকাশের স্তর পরম্পরায় কাব্যকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে— "গদ্যের ভাষার মধ্যে যেটুকু নিজস্ব শব্দশক্তি রয়েছে তা সাধারণত বস্তুকে আমাদের বুদ্ধিগত ধারণার কাছে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে মাত্র; কিন্তু কবির বাণী আত্মার সত্যকে মননজাত অভিজ্ঞতার সত্যকে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও জীবনের সত্যকে দেখে এবং আমাদের অন্তরে ছন্দিত বাণী শ্রবণের মাধ্যমে জাগ্রত সূক্ষ্ম মানস দৃষ্টির কাছে চিত্রকল্পের সাহায্যে সশরীরে উপস্থাপিত করে, ভাব ও বস্তুর আধ্যাত্মিক জীবন্ত প্রত্যক্ষ রূপটি তুলে ধরে।"[৮]

ডারউইনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদ জড় থেকে প্রাণের বিবর্তনের ধারা নিয়ে বিশ্লেষণ হয়েছে। আর শ্রীঅরবিন্দ মনকে নিয়ে গেছেন এক নতুন বিবর্তনবাদের ধারায়। তিনি মনে করেন কবি ও লেখকদের সাহিত্যবিচারে এই বিবর্তনের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি কতকগুলো স্তরের কথা বলেছেন—উর্দ্ধমানস, জ্যোতির্মানস, বোধিমানস, অধিমানস ও সবশেষে অতিমানস।

এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ চলেই আসে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল অন্তর ধর্মে। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন— "আমাদের যে লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথেরও তাই, তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার তাঁর হল নিজস্ব পথ। "[৯]

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা স্বাভাবিক মিল আছে। দুজনেই দেখতে পেয়েছিলেন জন্মভূমির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অন্তরের শ্রদ্ধা। তিনি লেখেন নমস্কার কবিতা—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,

নহে ধন, নহে সুখ; কোনও ক্ষুদ্র দান
চাই নাই কোনও ক্ষুদ্র কৃপা;
...অখণ্ড বিশ্বাসে।[১০]

রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রবেশ করলেন আধ্যাত্মিক পথে। আবিষ্কার করলেন মানুষের দিব্যজীবনের অভিমুখে এগিয়ে চলার অভিযাত্রা। আবার প্রৌঢ় বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন— ''প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনের বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে,
অপ্রগলভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"।[১১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) উভয় মনীষীর কাছেই ছিল স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল যুগসন্ধি-রাত্রির অবসানে দুঃখ-বেদনা-মৃত্যুর তোরণ পার হয়ে প্রভাতের আরক্ত নূতনের আবির্ভাব। আর শ্রীঅরবিন্দ মনে করলেন প্রকৃতি পুরাতনকে চূর্ণ করে নূতনকে স্বাগত জানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের জন্ম এই সময়ে, আর্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় অরবিন্দ লিখলেন যে অতিমানসের অবতরণ তাঁর মধ্যে ও পার্থিবমণ্ডলে শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলেন তখন দুই মহাকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; যদিও তা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "অনেকদিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখবো। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল ...প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যা চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে; ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। ...মনে হল তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদন্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেননি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। ...আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন; যুক্তাত্মন: সর্বমেবা বিশন্তি। ...আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে:—শৃন্বন্তু বিশ্বে...।"[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা আজও আমাদের মনে আসন্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অপেক্ষায় জাগিয়ে রাখে। যুগে যুগে অবতার স্বরূপ মানুষেরা আমাদের আগামীর পথ দেখিয়ে যান। ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বিক্ষুব্ধময় জগতে যখনই দিশেহারা হই তখনই সেই মহাজীবনপারের পথিকেরা আলোকবর্তিকা জ্বেলে আমাদের সঠিক পথের দিশা দেন। ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার জগত আমাদের রুদ্ধ করে। বিশ্বমানবতার বোধ আমাদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে আলোয় আলোয় যুক্ত করে এবং চেতনাকে উচ্চগামী করে এনে দেয় মহাবোধি। শ্রীঅরবিন্দ তাই Universal beauty-র কথা বলেছেন। যার জন্য দরকার Inner eye, Inner ear, and aesthetic beauty. সমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার আনা যেতে পারে— "এক উন্নত আত্মার চেতনার বিকাশই তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে। Poetic vision তাঁর কাছে soul view; যা আমাদের উরদ্ধমানস থেকে অতিমানসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যার ফলশ্রুতি সুন্দর ও আনন্দের যজুনন্ধ অনুভুতিঃ পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।"[১৩]

সূত্র নির্দেশ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৩ ব.), *রবীন্দ্ররচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* চিত্রা, অন্তর্যামী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১৫৮।
২. Letters on Poetry, *Literature and Art*/Section-10
৩. শ', ড. রামেশ্বর, (১৯৯৫), *ভবিষ্যতের কবিতা,* শ্রীঅরবিন্দের *The Future Poetry* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরি, পৃ. ৩৫৪।

৪. *তদেব*, পৃ. ৩৫৪।
৫. *তদেব*, পৃ. ৩৫৪।
৬. সেনগুপ্ত, শ্রীসুবোধ, (১৩৫৭ ব.), *আনন্দবর্ধন—বিরোচিত ধ্বন্যালোকঃ*, এ, মুখার্জী এন্ড কোং, লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ১৩৮।
৭. চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ, (১৯৯০), *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*, কারেন্ট বুক স্টল, ১, পৃ. ১০৭।
৮. শ', ড. রামেশ্বর, (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫০।
৯. গুপ্ত, নলিনীকান্ত, (১৯৭৫), রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ, শৃঙ্খন্ত, পৃ. ৪৫১।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩১৪ ব), *সঞ্চয়িতা*, সাময়িক পত্র, নমস্কার, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৪৮৪।
১১. গুপ্ত, নলিনীকান্ত, (১৯৭৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৩।
১২. *তদেব*, পৃ ৪৫৩।
১৩. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, (১৪১৩ ব.), *সৌন্দর্য দর্শন: শ্রীঅরবিন্দ ও অবনীন্দ্রনাথ*, প্রজ্ঞা বিকাশ, পৃ. ৪৪।